Subject: Bengali, SEM-II, BNG-C 204 (CBCS), Unit: II

চর্যাপদ: নামকরণ পর্যালোচনা

সুজিতকুমার পাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

- -

চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চর্যাপদকে নিয়ে বাঙালির গর্বের অন্ত নেই। বাংলাদেশের মানুষ তথা সমগ্র বাঙালির জীবনচর্যা এরমধ্যে ধরা পড়েছে। কি সাহিত্য, কি ধর্ম দর্শন, কি সঙ্গীত, কি প্রকৃতিভাবনা, ভাষা ভাবনা, মানব ভাবনা, সবক্ষেত্রেই সমকালীন জীবনকথায় সমৃদ্ধ হয়েছে চর্যাপদ। আজ বাংলা সাহিত্য ও ভাষার নানাদিক থেকে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন হয়েও এর বৈচিত্র্য সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। এমনভাবে সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের নজির বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে।

চর্যাপদ বাঙালির লেখা নয়। অথচ বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্য। অথচ এই পদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনপ্রণালী হিসেবেই রচনা করা হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধদের নিজস্ব সৃষ্টি এই পদগুলি। অথচ বাঙালিদের জীবনচর্যায় পরিপূর্ণ পদগুলি। তবে বাঙালি জীবনচর্যা থাকলেও বৌদ্ধদের সাধন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে পদগুলি। এককথায় দেখা যায় বাঙালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপূর্ব সংমিশ্রণ এখানে ঘটেছে। কারণ এই পদের অন্যতম কবি ভুসুকুপাদের রচনায় বাঙালি ভাবনা ও সংস্কৃতির বেশকিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি নিজেকেও এক সময় বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে বলেছিলেন –

> "বাজ ণাব পাড়ী পঁউয়া খালেঁ বাহিউ
>
> অদঅবঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।
>
> আজি ভূসু বঙ্গালী ভইলী
>
> ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।"[১]

এ থেকেই বোঝা যায় বাঙালি ভাবনা ও সংস্কৃতি পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী হয়েছিল। অনেকক্ষেত্রে মনে হয় এই ভাবনা থেকেও চর্যাপদ যে বাংলা ভাষার সম্পদ তা প্রমাণ করতে সহায়তা করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন – "১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখনি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম "চর্য্যাপদ"। আর একখানি পুস্তক পাইলাম - তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে। . . . আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙালী

ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।”[২] এইভাবে বাঙালিয়ানার প্রমাণ বিভিন্ন সূত্রে চর্যাপদ সম্পর্কে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের নামকরণের ক্ষেত্রে নানা ভাবনা কাজ করেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৯০৭ সালের আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন সম্পদের কথা কেউ জানতেন না। তুর্কী রাজত্বের পরবর্তী সময়ে নেপাল বৌদ্ধদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই ভেবে বাংলা পুথির সন্ধানে একাধিকবার নেপালে যান। ১৮৯৭-৯৮ সালে তিনি দুবার নেপালে গিয়ে কয়েকটি সংস্কৃত পুথি উদ্ধার করেন। তা দেখে তাঁর মনে হয় বাংলায় ধর্মঠাকুরের পুথিপত্রে বৌদ্ধধর্মের যে লক্ষণ রয়েছে নেপালে বৌদ্ধধর্মের সুবিস্তৃত সংস্করণ থাকতে পারে। এই ধারণা থেকেই নেপাল থেকে ফিরে তিনি ‘Discovery of Living Buddhiism in Bengal’ নামে গ্রন্থ লিখে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন ও ভাবনা প্রকাশ করেন। এই ভাবনা থেকেই ১৯০৭ সালে তিনি আবার নেপালে যান। সেইসময় তিনি নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের বেশকিছু পদ উদ্ধার করেন, সেই সময় তিনি জানতেন না এই পদগুলি আসলে কোন ধরনের পদ বা কোন ভাষায় লেখা। তাই দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে পদগুলিকে সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সাল থেকেই জানা যায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব। এই গ্রন্থে ৫০ টি পদ সংকলিত হয়েছে। তারমধ্যে ২৩ সংখ্যক পদটি খণ্ডিত, পরবর্তী ২৪ ও ২৫ সংখ্যক পদের পাঠ পাওয়া যায়নি। আবার ৪৮ সংখ্যক পদের পাঠও পাওয়া যায়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট সাড়ে তিনটি পদের পাঠ পাওয়া যায়নি। তাই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের যথার্থ সংকলন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়’-এ করেছিলেন। তবে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার যে তিব্বতী অনুবাদ পেয়েছিলেন তাতে এই কয়েকটি চর্যার তিব্বতীয় অনুবাদের সন্ধান মিলেছে।

চর্যাপদে মোট ২৩ জন সিদ্ধাচার্যের পদ পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণাচার্যের পদ সংখ্যা - ১৩, ভুসুকুর - ৮, সরহের - ৪, কুক্কুরীপাদের - ৩, লুই, শবর ও শান্তি প্রত্যেকের ২, এছাড়া অবশিষ্ট সিদ্ধাচার্যগণের ১ টি করে পদের উল্লেখ রয়েছে। অবশিষ্ট সিদ্ধাচার্যগণ হলেন আর্যদেব, কঙ্কণপাদ, কম্বলাম্বর, গুণ্ডরীপাদ, চাটিলপাদ, ডোম্বীপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, তন্ত্রীপাদ, জয়নন্দী, তাড়কপাদ, দারিকপাদ, গুঞ্জুরীপাদ, বিরুবাপাদ, বীণাপাদ, ভদ্রপাদ, মহীধরপাদ।

প্রায় এক হাজার বছর পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে প্রতিপন্ন চর্যাপদের উদ্ধার হওয়া বাঙালি মানুষের কাছে আশ্চর্য তো বটেই। এত বছর ধরে বাংলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদ বাংলায় ছিল না। এর আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন সম্পর্কে কেউ জানতেন না। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নানাজনের নানা মত ছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার দিক থেকে প্রমাণ করেন এটি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে সুপ্রযুক্ত। সাহিত্য হিসেবেও এটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হিসেবেই এখনো পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

‘চর্যাপদ’ আসলে লৌকিক নাম হয়ে গেছে। কারণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশকালের সময় এর নাম দেন ‘চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়’। ১৯১৬ সালে সংকলন গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’। এই গ্রন্থে চারটি বিষয় ছিল -‘চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়’,’ ‘সরোজবজ্রের দোহাকোষ’,

‘কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ’, ‘ডাকার্ণব’। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এই চারটি বিষয়ই হাজার বছর আগের সৃষ্টি হিসেবে অনুমিত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা। সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষের ভাষা পূর্বী অপভ্রংশ আর ডাকার্ণবের ভাষা পশ্চিমী অপভ্রংশ। অথচ ‘চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়’ এই নামটির মধ্যে বাঙালি ভাবনা নেই, সংকলক বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থের নাম অনুসরণ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সেইসময় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থাদি নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কিছু শব্দ সজ্জার ব্যবহার ছিল - ইতিবাচক শব্দ + নেতিবাচক শব্দ + বিনিশ্চয়। যেমন আচার্য তেজারির ‘ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়’, আবার বৌদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ ‘রুজ্‌বিনিশ্চয়’,নামের মধ্যে ‘বিনিশ্চয়’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, অনঙ্গবজ্রের ‘প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি’ এ ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

‘চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়’ প্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত চর্যাপদের বহু গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। নামকরণ নিয়েও বিভিন্নজনের মত পাওয়া গিয়েছে। সময় অনুসারে এর নাম নিয়ে নানাজন নানা কথা বলেছেন। এবার দেখা যাক এর নাম সঠিকভাবে কোনটা সুপ্রযুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে চর্যাপদের সংকলন নিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনাম ও সংকলকদের একটা তালিকা করে নেওয়া যেতে পারে। তারপর নামকরণ বিষয়ে আলোচনায় আসা যেতে পারে।

১) চর্য্যাপদ - মণীন্দ্রমোহন বসু - ১৯৪৬
২) চর্য্যাগীতিকোষ - ড প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষু - ১৯৫৬
৩) চর্য্যাগীতি পদাবলী - ড সুকুমার সেন - ১৯৫৬
৪) চর্যাগীতি পরিচয় - সত্যব্রত দে - ১৯৬০
৫) চর্যাপদ - শান্তিরঞ্জন ভৌমিক - ১৯৬১
৬) চর্যাগীতি - তারাপদ মুখোপাধ্যায়- ১৯৬৫
৭) চর্যাপদ - অতীন্দ্র মজুমদার - ১৯৬০
৮) চর্যাগীতি পরিচিতি - এবাদত হোসেন - ১৯৭০
৯) চর্যাগীতির ভূমিকা - জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী - ১৯৭৬
১০) চর্যাগীতিকোষ - নীলরতন সেন - ১৯৭৮
১১) চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা - সুমঙ্গল রাণা - ১৯৮১
১২) চর্যাগীতি পরিক্রমা - নির্মল দাশ - ১৯৮১
১৩) চর্যাগীতিকা (বৌদ্ধগান ও দোহা) - সৈয়দ আলী আহসান - ১৯৮৪
১৪) নব চর্যাপদ - ড শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংকলিত, ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত - ১৯৮৯
১৫) চর্যাপদ - জ্যোতিপাল মহাথের - ১৯৯০
১৬) বৌদ্ধ চর্য্যাপদ - এস এম লুৎফর রহমান - ১৯৯০

এছাড়াও পণ্ডিত মহল চর্যাপদকে নানা নামে উল্লেখ করেছেন। সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল। এ থেকে চর্যাপদের বৈচিত্র্য সম্পর্কেও ধারণা হতে পারে।

১) আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় - বিধুশেখর শাস্ত্রী - নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালার ক্যাটালগে এই নামটি আছে।

২) চর্য্যাপদ - ড প্রবোধচন্দ্র বাগচী - ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ নং জার্নালে এর উল্লেখ আছে।
৩) চর্য্যাগীতিকা - ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯৫৯ সালের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)।
এইভাবে দেখা যায় চর্যাপদের নামকরণ বিষয়ে বহু পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'চর্যাপদ' এই নামেই একাধিক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এই নামটি আসলে 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়'- এর লোক প্রচলিত সংস্করণ। এটাও ঠিক 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়' নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিজের দেওয়া। কারণ চর্যাপদের প্রকৃত নাম তিনিও পাননি। মূল পুথিটির নামপত্র (Title Page), সমাপ্তিসূচক টীকাকার ও লিপিকরদের পরিচয় (Colophon Page) পাওয়া যায়নি। গ্রন্থের আরম্ভে নান্দীবাচক শ্লোকে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাশ্চয়ে' শব্দটি আছে। নেপালের জাতীয় অভিলেখালয়ের (National Archives) গ্রন্থ তালিকায় 'আশ্চর্য্যচর্যাচয়টীকা' (গ্রন্থ তালিকাঃ ১৯৯৪/৪১২, পরিবর্তিত ৪০১) লেখা আছে। পুথিটির বাইরের পাতায় নাগরী হরফে লেখা 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' । প্রবোধচন্দ্র বাগচী পরবর্তীকালে এই পুথির যে তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন সেটির নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি', সংস্কৃত টীকাকারের নাম মুনিদত্ত আর তিব্বতী অনুবাদকের নাম কীর্তিচন্দ্র। এবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়' শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চর্যা শব্দটি 'চর্' ধাতু থেকে জাত। প্রচীন অর্থ হিসেবে বলা যায় ভিক্ষুব্রতে অবস্থান করা। তারপর ধীরে ধীরে আচারমূলক উপদেশাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা যা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হত, সেগুলিকে 'চর্যা' বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ যা আচরণ করা উচিত। সুতরাং 'অচর্য' শব্দের অর্থ অনাচরণীয় অর্থাৎ যা করা উচিত নয়। বিনিশ্চয় শব্দের অর্থ বিচারমূলক নির্দেশনা, অর্থাৎ নিশ্চিত করে নির্দেশ করা। কি আমাদের করা উচিত বা কি আমাদের করা উচিত নয় যা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা হয় তারই অর্থ 'চর্য্যাচর্য্য - বিনিশ্চয়'। হয়তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাবনা ধরেই চর্যাপদের নামকরণ করেছিলেন 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়'।

কিন্তু মূল পুথিতে 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়' নামটির উল্লেখ না থাকায় নামকরণ নিয়ে সংশয় দেখা যায়। আবার তিনি নিজেই ১৯১৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 'A Catalogue of Palm leaf and selected papers MSS belonging to the Durbar Library, Nepal' প্রকাশ করে দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসেবে 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' উল্লেখ করেছিলেন। অথচ দেখা যায় ১৯১৬ সালে বাংলা সংকলন গ্রন্থ হিসেবে চর্যাপদের নাম দেন 'চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়'। 'চর্য্যাচর্য্যটীকা'র কথা আর উল্লেখ করেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রী মহাশয়ই বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন এর প্রকৃত নামকরণ বিষয়ে। এই নামকরণ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। 'Indian Historical Quarterly' পত্রের ৪ র্থ সংখ্যা (১৯২৮) তিনি বললেন মুনিদত্তের টীকার প্রসঙ্গ। সেই টীকা উল্লেখ করে বললেন -

'শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে

সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্।।'[৩]

এখানে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' নামটি পাওয়া যায়। তাই তাঁর মতে চর্যাপদের নাম হওয়া উচিত 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়'। উক্ত শ্লোকের অর্থ হল - অদ্ভুত চর্যাগুলির মধ্যে প্রবেশের জন্য তিনি নির্মল, সরস সহজবোধ্য ভাষায় টীকা

রচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' নামটি শ্লোকের মধ্যে আছে বলেই এমন নামকরণ করা যায় না। কারণ শ্লোকটির অর্থ অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। এদিকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী Calcutta Oriental Journal (Vol:1), 'Some Aspects of Buddhist Mysticism' প্রবন্ধে চর্যাপদের নাম হিসেবে উল্লেখ করলেন 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'। কিন্তু এমন নামকরণের কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যেও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এবার একটু অন্যদিকের আলোচনায় আসা যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি আবিষ্কার করেন সেটি মুনিদত্তের 'চর্যাকোষবৃত্তি'র টীকা গ্রন্থ। এই 'চর্যাকোষবৃত্তি' ৫০ টি পদের সংলকন। মুনিদত্ত শিষ্যদের বোধপ্রতিপাদনের জন্য পদগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই হিসেবে 'চর্যাকোষবৃত্তি' নামটিকেই চর্যাপদের প্রকৃত নাম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল 'চর্যাপদ' এই নামটি অধিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। 'পদ' শব্দটি মূলত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অধিক প্রযোজ্য ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের গানগুলিকে সাধারণত 'পদ' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। পদের মধ্যে গানের সুর থাকে। চর্যায় সঙ্গীতেরই প্রাচুর্য। কখনো কখনো সঙ্গীতই এখানে মুখ্য বিষয় বলে মনে হয়। কারণ পদগুলির প্রথমেই রাগ রাগিণীর নাম বলা হয়েছে। এখানে মোট ১৮ টি রাগ রাগিণী আছে। পটমঞ্জুরী, গবড়া, অরু, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বরাড়ী, বলাড্ডি, শীবরী, মল্লারী, মালসী, কহু গুঞ্জরী, বঙ্গাল, মালসী গবুড়া প্রভৃতি। এরমধ্যে পটমঞ্জরী ১১ টি পদের রাগ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। কারণ এই রাগটি সেইসময় বেশ জনপ্রিয় রাগ হিসেবে প্রচলিত ছিল। গানের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের চর্যার বিষয় ব্যক্ত করা হত। সেই হিসেবে একে 'চর্যাগীতি' বলাও যুক্তিসঙ্গত। কারণ চর্যার মুখ্য বিষয় গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হত। যাই হোক 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতি' লৌকিক নাম, এর উৎস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাধারণের কাছে এই নাম দুটির গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম। অনেকেই এই দুটি নাম দিয়েই বেশ কিছু চর্যার সংকলন প্রকাশ করেছেন।

চর্যাপদকে অনেকেই ভাষার বিচারে 'সন্ধ্যাভাষা' হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। সেই হিসেবে এর নাম 'সন্ধ্যাভাষা' বলে কেউ কেউ মনে করেন। স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এরভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বলেছিলেন। কারণ এর ভাষার অর্থ অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তাই তিনি বলেছিলেন - 'সন্ধ্যাভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচুঁ অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'[৪] তবে ভাষার অর্থের দিক থেকে এর ভাষার নাম 'সন্ধ্যা ভাষা' হতে পারে। কিন্তু চর্যাপদের সংকলনটির নাম 'সন্ধ্যা ভাষা' হতে পারে না। এখনো পর্যন্ত এমন নামকরণ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ হয় নি। সাধারণের কাছে 'সন্ধ্যা ভাষা' নামটি 'চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদে'র সঙ্গেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে চর্যাপদের নাম হিসেবে লৌকিক নাম 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতি' গ্রহণযোগ্য হতেই পারে। কিন্তু চর্যাপদ সংকলটির প্রকৃত নাম মুনিদত্তের দেওয়া নামটিই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ মুনিদত্তের টীকা থেকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার গানগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। আর সেই টীকার নাম যেহেতু 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' সেহেতু এই নামটিকেই পণ্ডিত মহলের

অনেকেই মেনে নিয়েছেন। তবু একথা বলতেই হয় ‘চর্যাপদ’ সংকলনের নাম যাই হোক না কেন আসলে লৌকিক নাম ‘চর্যাপদ’ই থেকে যায়।

<u>উৎস পরিচয়</u>

১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা),৪৯ নং পদ, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৩

২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা), মুখবন্ধ, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪ - ৬

৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা), চর্য্যাচর্য্য- বিনিশ্চয়, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১

৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা), মুখবন্ধ, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮